থিয়েটার: এই সময়

ব্রাত্য বসু

থিয়েটার সবসময়েই এই সময়ের। হয়তো তাতেই থিয়েটারের সার্থকতা—হয়তো তাতে থিয়েটারের দুর্বলতাও। কেননা যে থিয়েটারের স্মৃতি বস্তুতঃ শ্রুতি হয়ে থাকছে—তা অনাগতর ইতিহাস চেতনা তৈরি করছে যেমন, তেমনই ওই ইতিহাসের রন্ধ্রপথে নিঃশব্দে প্রবেশ করছে আমাদেরই নানান গুজব, বাহানা এবং নতমুখ অনৃতভাষণ। ফলে থিয়েটারের শ্রুতির ইতিহাস এবং লিখিত ইতিহাস—এ দুয়ের মধ্যে আসলে রয়ে যাচ্ছে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। আশা রাখি কোনও একদিন কোনও সুস্থ সুন্দর স্পষ্ট মূল্যায়ন এই ব্যবধান দূর করে কাঙ্খিত সেই স্বচ্ছতা এনে দেবে।

তাছাড়া থিয়েটার যেহেতু তার মাধ্যম জনিত কারণে এই তাৎক্ষণিক জন্ম দেয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ার রেশ উক্ত দর্শক পরে নানাবিধ সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটু একটু করে নিজের ভেতরেই বদলে নেন, আর যেহেতু তার সেই প্রাথমিক শুদ্ধ প্রতিক্রিয়াটুকু আবার নতুন করে যাচাই করে নেবার অন্য কোনও উপায় থাকে না অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ না তিনি দ্বিতীয় অভিনয়টি দেখেছেন ফলে এই শ্রুতি বকযন্ত্রে চোলাই হয়ে যখন উত্তরকালে এসে পড়ে তখন শত শত ঝর্ণাধ্বনি হয়তো বা ওই শুদ্ধ প্রতিক্রিয়াটুকুকে অস্ফুট করে দেয়। দিতে থাকে। আর এইভাবে তৈরি হয় থিয়েটারের সময়, সময়ের থিয়েটার, তার নির্মাণ-বিনির্মাণের নিজস্ব প্রণালী।

কথা ছিল থিয়েটার তার সময়কে ধরে রাখবে নানান ছন্দে, নানান চিহ্নে, নানান ভাষ্যে। ভাবুন, এমন এক শুদ্ধ মাধ্যম—যার কোনও সংস্করণ নেই। একবারই সময়ের বুকে তার জন্ম হচ্ছে আবার সময়েরই বুকে মাথা রেখে মৃত্যু হচ্ছে তার। ফলত 'রক্তকরবী'র একশত রজনী অভিনয় হবার অর্থ পৃথক পৃথক একশ'টি রক্তকরবী অভিনয়ের জন্ম এবং মৃত্যু। রক্তকরবীর নন্দিনীর অভিনয় তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে তা অর্থ পাবে, সেই অভিনয়ই সেই অভিনেত্রীরই বদলাতে পারে চীনযুদ্ধের সময় বা বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে বা মেধা পটেকারের নর্মদা আন্দোলনে। অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁর উচ্চারণে, গলার বিভঙ্গে, শরীরমুদ্রায় আসলে প্রকাশ করতে করতে যান, ব্যাখ্যা করতে করতে যান সংলাপের মধ্যবর্তী সেই আশ্চর্য নীরবতাকে—যে নীরবতার অর্থ কখনও রাজনীতি, কখণও প্রেম, কখনও প্রতিবাদ, কখনও আমাদের বাঁচতে চাওয়ার উন্মুখ অভিপ্রায় যা আসলে এক মহাসময়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, যা হয়তো আমাদের কখনও বিশদে বোঝায় আবার কখনও বা সাঁটে। থিয়েটারের সেই অলৌকিক যাদুবিদ্যা তাই আমাদের আচ্ছন্ন করে, স্তব্ধ করে, অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে আবার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটায় আবার বিপন্ন অসহায় করে তোলে।

সময়ের হাড়মাংস খুঁটে যে সমসময়কে দেখায় আর নির্মোহ উন্মোচন করে ইঙ্গিত দেয় মহাসময়ের। আমরা সেই বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে আসা বিখ্যাত সরণীতে বিন্দু হয়ে দেখছি আমাদেরই পায়ের তলা থেকে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে চলে যাচ্ছে এই সময়, ভবিষ্যতের সেই মহাসময়ের মোহনায় মিলিত হবে বলে। থিয়েটার আমাদের তাই সেই অতীত, যে বর্তমানের সঙ্গে কথা বলে ভবিষ্যতের অনিবার্য গর্ভে চলে যাবে বলে।

আসুন এইবারে তবে বিষয়ে প্রবেশ করি। আসুন জানাই তাহলে নন্দিনীর কথা উঠলেই যখন, একটু কিশোরেরও কথা বলি। কিশোর—অর্থাৎ রক্তকরবীর তো বটেই আবার কল্যাণীরও। অর্থাৎ কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের। ওর 'খোয়াবনামা' দেখে আচ্ছন্ন হয়েছি আমি, সেই অনুভব—আসুন আপনারও সঙ্গে বিনিময় করি। ওই রকম দুরূহ উপন্যাসকে যে দু-আড়াই ঘণ্টার পরিসরে মঞ্চে বিন্যস্ত করা সম্ভব—তা কিশোরই আমাকে জানালো। মনে পড়ে সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর কথা, মনে পড়ে গৌতম হালদারের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর কথা, মনে পড়ে মণীশ মিত্রের 'শেষ রূপকথা'র কথা। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় কখনও উপন্যাস আবার কখনও বা কাব্য কীভাবে শিল্পিত অবয়বে ঢুকে পড়ছে নাট্যের নির্দিষ্ট পরিসরে। যেভাবে প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীর শরীরছন্দকে সংকেতে এবং সজোরে ব্যবহার করেছেন, যেভাবে মাছ ধরার জাল, খাপলা আর বিভিন্ন তলের সুষম ব্যবহার ঘটিয়েছেন তা বাংলা থিয়েটারে নিঃসন্দেহে অভিনব। সুমনের কাজে আমরা পেয়েছিলাম এক অনন্য শৈলী, যে শৈলী গাম্ভীর্যের প্রকাশ্যে স্বতন্ত্র, গৌতমের নাট্যভাষা তার পাশাপাশি সতত উচ্ছলতে সমস্ত সীমান্তে অতিক্রমকারী নাট্যিক নিরীক্ষায় স্বতন্ত্র—মণীশের 'শেষ রূপকথা' যেখানে ছিল দমবন্ধ করা শ্বাসরোধকারী এক কঠিন কুলিশ বাস্তবতার সমীপবর্তী অথচ বাস্তবোত্তর উত্তরণ। সেখানে কিশোর সেই ঐতিহ্যের এক নতুন মাত্রা সংযোগ করলেন যেন, বিশেষত 'খোয়াবনামা'র মতো আন্তর্জাতিক মানবসম্পন্ন উপন্যাস, যেখানে তমিজের সঙ্গে আমরাও ডিঙি মেরে দেখে নিই একটি অঞ্চল ভূখণ্ডকে যেমন, তেমনই সেই অঞ্চলের সঙ্গে সন্নিহিত হয়ে থাকা নানান কৃত্যকে, বহু রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীকে, বহু জীবনের বারোমাস্যাকে, সুখদুঃখের বলে যাওয়া আজস্র বর্ষা-বসন্তকে। এইভাবে থিয়েটার তার নিজের তৈরি করা বেড়া ভেঙে দেয়, নিজেরই সীমান্ত অতিক্রম করে সে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই।

ফলে এই সময় নিশ্চিত ভাবেই তাৎপর্যময় অর্থে আন্দোলিত হয়ে আছে গৌতম-সুমন-কৌশিক-মণীশ-শুভাশিস-শাশ্বতী-চন্দন-কিশোর-ঋষি-দেবেশে-অনির্বাণ-শান্তনু-সন্দীপ-তরুণ-পার্থ-আশিস-দেবাশিসদের প্রয়োগে, দেবশঙ্কর-পীযূষ-সুরঞ্জনা-সুরজিত-বিমল-শান্তি-রজতাভ-সুদীপ-কাঞ্চন-সুপ্রিয়-শঙ্কর-পুলক-শ্যামল-বিপ্লব-সোহিনী-মানসী- রতন-হিল্লোল-সঞ্জীব-জহর-তরঙ্গদের অভিনয়, সুদীপ-অশোক-জয়-উত্তীয়দের আলোয়, সুপ্রীতি-হর-ইন্দ্রাশিস-কৌশিক-শেখর-সংগ্রামদের লেখায় এবং আরও নানান কৃতিতে। এ সবই যে একই সুরে চলছে, একই তালে বাজছে, একই প্রকাশে প্রকাশিত হচ্ছে—তা হয়তো নয়—তার বিভিন্ন মুখ, বিভিন্ন লয়, বিভিন্ন ভাষা আছে—তবু তার মধ্যে এক পরম ঐক্যও আছে। হয়তো সে ঐক্য সময়ের, কিছুটা হয়তো এই মহাসময়েরও।

ভাষ্যটি শেষ করি ব্লাইন্ড অপরেরা 'থাকে শুধু নচিকেতা' প্রযোজনাটি দিয়ে। প্রযোজনাটি দেখে শুধু মুগ্ধ হয়েছি নয়—আশ্চর্য হয়েছি। পরিচালক শুভাশিস, যেভাবে নাট্যভাষার আশ্চর্য

সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছেন এবং পোশাকের যে সমস্ত বিশিষ্টতা প্রয়োগ করেছেন তা আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। সেই সঙ্গে সুষম অলো ও চমৎকার অভিনয় (বিশেষত নচিকেতা চরিত্রের অনবদ্য অভিনেতাটি, যার নাম আমি জানি না) এমন এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছে যা বহু কথিত সম্পূর্ণ থিয়েটারের সমতুল্য। প্রযোজনাটি আমাদের সবার দেখা উচিত—উচিত একেবারেই অন্ধরা অভিনয় করেছেন বলে নয় বরং একটি সম্পূর্ণ আশ্চর্য পারফরমেন্স দেখার জন্য। আসুন আমরা সবাই মিলে এই প্রযোজনাটিকে কুর্নিশ করি। আসুন এখন আড়চোখে একে অপরকে দেখার সময় নয় আমরা ইতিহাসের সেই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি—যেখানে অকরুণ সময়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কিছু মগ্ন নাবিক মাঝদরিয়ায় নৌকা ভাসিয়েছেন। আসুন আমরা এই সময়ে স্পষ্টভাবে একে অপরকে দেখি।